উজ্জ্বল উদ্ধার

প্রসঙ্গ : কথামৃতের একটি গল্প

সুব্রতা সেন

আজ অগ্রহায়ণ পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি, শুক্রবার, ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর। বড়দিন উপলক্ষ্যে বেশ কদিন স্কুল বন্ধ। মাস্টার মহাশয় (শ্রীম) অবকাশটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র সান্নিধ্যে বাস করে তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কিছুদিন সাধন-ভজন করবেন—এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হয়েছেন। যথারীতি সারাদিন আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ চলেছে। বিকেলের দিকে কয়েকজন ভক্ত এসেছেন। নানা কথার পর শ্রীরামকৃষ্ণ মণির (শ্রীমর) দিকে তাকিয়ে বলছেন : ''অনুরাগ হলে ঈশ্বরলাভ হয়। ...খুব ব্যাকুলতা হলে সমস্ত মন তাঁতে গত হয়।'' আবার বলছেন : ''বালকের মতো বিশ্বাস! বালক মাকে দেখবার জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, সেই ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতা হল তো অরুণ উদয় হল। তারপর সূর্য উঠবেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বরদর্শন।'' প্রসঙ্গত সরল শিশুর বিশ্বাস ও ব্যাকুলতার ফলে সাক্ষাৎ ঈশ্বরদর্শনের তিনি তিনটি উদাহরণ দিয়েছেন। প্রথমটি হল, বালবিধবা একটি বালিকার, যে তার পিতার পরামর্শে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে গৃহদেবতা গোবিন্দজীর সাক্ষাৎ দর্শন পেয়েছিল। এই মেয়েটির পরিচয় না জানা গেলেও বালিকা বয়সে বিশ্বাস ও ব্যাকুলতার ফলে ঈশ্বরলাভের ঐতিহাসিক পরিচয় বহন করছে মীরাবাঈ, জনাবাঈ প্রভৃতির জীবনবৃত্তান্ত। শ্রীরামকৃষ্ণের দেওয়া দ্বিতীয় উদাহরণটি বহুল প্রচলিত মধুসূদনদাদা ও জটিল বালকের স্নেহ-ভালবাসায় ভরা মধুর কাহিনি।

তৃতীয় উদাহরণটি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে দেওয়া হয়েছে এইভাবে—''একটি ব্রাহ্মণের বাড়িতে ঠাকুরের সেবা ছিল। একদিন কোন কাজ উপলক্ষে তার অন্যস্থানে যেতে হয়েছিল। ছোট ছেলেটিকে বলে গেল তুই আজ ঠাকুরের ভোগ দিস, ঠাকুরকে খাওয়াবি। ছেলেটি ঠাকুরকে ভোগ দিল। ঠাকুর কিন্তু চুপ করে বসে আছেন। কথাও কন না, খানও না। ছেলেটি অনেকক্ষণ বসে বসে দেখলে যে, ঠাকুর উঠছেন না! সে ঠিক জানে যে ঠাকুর এসে আসনে বসে খাবেন। তখন সে বারবার বলতে লাগল, ঠাকুর, এসে খাও, অনেক দেরি হল; আর আমি বসতে পারি না। ঠাকুর কথা কন না। ছেলেটি কান্না আরম্ভ করলে। বলতে লাগল, ঠাকুর, বাবা তোমাকে খাওয়াতে বলে গেছেন; তুমি কেন আসবে না, কেন আমার কাছে খাবে না। ব্যাকুল হয়ে যাই খানিকক্ষণ কেঁদেছে, ঠাকুর হাসতে হাসতে এসে আসনে বসে খেতে লাগলেন!

ঠাকুরকে খাইয়ে যখন ঠাকুরঘর থেকে সে গেল, বাড়ির লোকেরা বললে, ভোগ হয়ে গেছে; সে-সব নামিয়ে আন। ছেলেটি বললে, হাঁ হয়ে গেছে; ঠাকুর সব খেয়ে গেছেন। তারা বললে, সে কি রে! ছেলেটি সরল বুদ্ধিতে বললে, কেন, ঠাকুর তো খেয়ে গেছেন। তখন ঠাকুরঘরে গিয়ে দেখে সকলে অবাক্!"[১]

সুখের বিষয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে এই ছেলেটি ও তার পরিবারের পরিচয় বিশালভাবেই পাওয়া গেছে। ছেলেটির নাম রঘুনন্দন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাধন্য এক পরিবারে অসাধারণ এই বালকটি স্বয়ং মহাপ্রভুর স্বীকৃত পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে এই পরিবার অতি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় : ''তিন পুরুষের আমীর হলে তবে তো লোকে মানবে।" আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যে রঘুনন্দনের পরিবার সত্যই তিন পুরুষের আমীর। রঘুনন্দনের অসাধারণত্ব উপলব্ধি করতে হলে তাঁর পরিবারের অবদান এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাদৃষ্টির বিষয়টি না জানলে চলে না। আশা করি ভক্ত পাঠকদের রঘুনন্দনের আবির্ভাবের পশ্চাৎপট ও তার জীবনকথা জানতে ভালই লাগবে।

পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার (যার প্রাচীন নাম কণ্টকনগর) কাছে ভাগীরথীর পশ্চিমদিকে অবস্থিত শ্রীখণ্ডগ্রাম গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর কাছে বিশেষ আদৃত এক তীর্থ। প্রাচীন গঙ্গা থেকে দূরে বলে এই এলাকা কখনও জলপ্লাবিত হয়নি, কাজেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর কিছু স্মৃতিচিহ্ন এখনও শ্রীখণ্ডে বর্তমান। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তদের চরণস্পর্শে ধন্য এই গ্রামে দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ সুপণ্ডিত নরনারায়ণ বাস করতেন। তাঁর গৃহদেবতা গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণ। নরনারায়ণের দুই পুত্র, মুকুন্দ ও নরহরি। জ্যেষ্ঠ মুকুন্দ চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তাঁর খ্যাতি শুনে গৌড়ের নবাব তাঁকে গৃহচিকিৎসক নিযুক্ত করেন। নরনারায়ণ দেহত্যাগ করলে গৃহদেবতার সেবা-পূজা ও নরহরির সুশিক্ষার দায়িত্ব মুকুন্দের উপরে পড়ল। মুকুন্দ উপযুক্ত শিক্ষার জন্য নরহরিকে নবদ্বীপে পাঠালেন এবং গৃহদেবতার সেবার সুবন্দোবস্ত করে একরকম বাধ্য হয়েই গৌড়ে চলে গেলেন। নরনারায়ণের ভক্তিমত্তা ও বিদ্যাবত্তার সার্থক উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন দুটি ভাই-ই। বিধর্মী শাসকের অধীনে ধনপুরী রাজধানীতে বাস করেও মুকুন্দ সর্বদা অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার মাধুর্য আস্বাদন করতে করতে জগতের সবকিছুই কৃষ্ণময় দেখতেন, তার উপর নবজলধর বা শিখিপুচ্ছ দৃষ্টিগোচর হলে কৃষ্ণরূপের উদ্দীপনায় প্রেমে একেবারে আত্মহারা হয়ে যেতেন। মনের এই অবস্থায় মুকুন্দ একদিন অসুস্থ নবাবকে দেখতে এলেন। নবাব তখন একটি উচ্চাসনে বসেছিলেন, রাজবৈদ্যকেও বসবার জন্য আর একটি উচ্চাসন দেওয়া হল। কথাবার্তার মাঝখানে নবাবের এক পরিচারক ময়ূরপুচ্ছের পাখা দিয়ে তার প্রভুকে বাতাস করতে শুরু করল। ময়ূরপুচ্ছ দেখা মাত্র শ্রীকৃষ্ণের রূপলাবণ্যচিন্তায় বিভোর মুকুন্দ একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে ভূতলে পতিত হলেন। অত উঁচু থেকে সোজা মাটিতে পড়ে যাওয়ায় নবাব মুকুন্দের মৃত্যু আশঙ্কা করে বিশেষ উদ্বিগ্ন হলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনায় (মধ্যলীলা, ১৫। ১২৪-১২৭) :

রাজার জ্ঞান রাজবৈদ্যের হইল মরণ।
আপনি নামিয়া তবে করাইল চেতন॥
রাজা বলে ব্যথা তুমি পাইলে কোন ঠাঁই।
মুকুন্দ বলে অতি বড় ব্যথা পাই নাই॥
রাজা বলে মুকুন্দ তুমি পড়িলা কি লাগি।
মুকুন্দ কহে রাজা মোর ব্যাধি আছে মৃগী॥
মহাবিদগ্ধ রাজা সেই সব বাত জানে।
মুকুন্দেরে হইল তার মহাসিদ্ধজ্ঞানে॥

অন্যদিকে মুকুন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরহরি অদ্ভুত প্রতিভাবলে অল্পকালের মধ্যেই একাধারে সুপণ্ডিত ও ভক্তিরসজ্ঞ হয়ে উঠলেন। দিবারাত্রি ভক্তসঙ্গে ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা করতে করতে নরহরির হৃদয়ে ইষ্টপ্রেমের স্ফূর্তি হল। তাঁর শ্রীঅঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার দেখা দিতে লাগল। তিনি সংস্কৃত ও মাতৃভাষায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলাবিষয়ক শ্লোক ও পদাবলি রচনা করে ইষ্টসঙ্গসুধা আস্বাদন করতে লাগলেন। এই অবস্থায় বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাসিবেশে তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন। স্বপ্নদশাকে তাঁর জাগ্রত অবস্থা জ্ঞান হয়েছিল এবং এক মুহূর্তের জন্যও তিনি সেই অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত দেবমূর্তিকে ভুলতে পারছিলেন না। তাঁর দশা তখন ''জাগিতে গৌরাঙ্গ ঘুমাতে গৌরাঙ্গ সদাই গৌরাঙ্গ দেখি।''[২] কয়েকদিন পরে গঙ্গাতীরে আপনমনে বেড়াতে বেড়াতে নরহরি আকস্মিকভাবে গৌরাঙ্গসুন্দরকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করলেন। নরহরির অবস্থা তখন 'ন যযৌ ন তস্থৌ'—এ কি সত্য না স্বপ্ন? সংবিৎ ফিরতেই প্রেমবিহ্বল নরহরি চিরদিনের জন্য নিজের মন-প্রাণ-সমর্পণ করে প্রভুর পাদপদ্মে প্রণত হলেন। শ্রীগৌরাঙ্গও তাঁকে সস্নেহে গ্রহণ করে নবদ্বীপের ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গকে কেন্দ্র করে তখন নবদ্বীপে সৎপ্রসঙ্গ ও সংকীর্তনানন্দের দিব্যমধু অহোরাত্র ক্ষরিত হতে থাকত। অচিরেই নরহরি নিজগুণে প্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মধ্যে স্থান করে নিতে পারলেন। শ্রীগৌরাঙ্গসান্নিধ্যে নরহরির ত্রিতাপ ঘুচে গেল বটে, কিন্তু স্বস্তি হল না। জ্যেষ্ঠভ্রাতা মুকুন্দকে বাদ দিয়ে অকৃতজ্ঞের মতো এই দুর্লভ সৌভাগ্যসুধা তিনি একাকী কেমন করে আস্বাদন করেন? তাঁর কেবলি মনে হতে লাগল, যাঁর অনুগ্রহে তিনি শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীগৌরচন্দ্রের অনির্বচনীয় সঙ্গ লাভ করে ধন্য হলেন, সেই স্নেহময় অগ্রজ কিনা বাধ্য হয়ে রাজধানী গৌড়ে রাজবৈদ্যরূপে বিষয়াবদ্ধ হয়ে রইলেন! মুকুন্দের অবস্থা মনে করে নরহরি প্রায়ই একান্তে অশ্রুপাত করতেন।

এইরকম একটি সময়ে হঠাৎ প্রভু স্বয়ং উপস্থিত হয়ে করুণার্দ্রকণ্ঠে নরহরিকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতার জন্য নরহরির এই রোদন—একথা শোনামাত্র আশ্বাস দিয়ে মহাপ্রভু জানালেন—চিন্তার কোনও কারণ নেই, মুকুন্দ অচিরেই এখানে আসবেন। ওদিকে অনেকদিন নরহরির কোনও খবর না পেয়ে মুকুন্দ গৌড় থেকে সোজা নবদ্বীপে চলে এলেন। প্রভুর লীলায় মুকুন্দের যখন নরহরির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তখন প্রভু নিজেও সেখানে উপস্থিত। মুকুন্দকে দেখামাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ চিরপরিচিতের মতো কুশল জিজ্ঞাসা করে পরম আদরে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন, মুকুন্দও প্রভুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে তাঁর চরণে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করে দিলেন। এই ঘটনায় নরহরি যে কী অসীম আনন্দ লাভ করলেন তা বর্ণনাতীত। এখন থেকে দুই ভাই-ই মহাপ্রভুর দুর্লভ সান্নিধ্যে পরমানন্দে কাল কাটাতে লাগলেন।

একদিন মহাপ্রভু আদেশ করলেন, নরহরি আজীবন ব্রহ্মচারিরূপে প্রভুর কাছে থাকুন আর মুকুন্দ শ্রীখণ্ডে গিয়ে ভবিষ্যতে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্য বিবাহ করুন। দুই ভাই-ই সংকল্প করেছিলেন, আজীবন ব্রহ্মচারী থেকে প্রভুর সমীপে বাস করবেন। এখন প্রভুর আদেশ শুনে মুকুন্দের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। তিনি অশ্রুপূর্ণলোচনে বলতে লাগলেন : ''প্রভু, আপনার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয় কিন্তু এইরূপ কঠিন আজ্ঞা আমার প্রতি কেন করলেন? বিশেষত আমার বিবাহের বয়স অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, নরহরি আমার চেয়ে অনেক ছোট, আমার পরিবর্তে সে বিবাহ করলে কি আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হতে পারে না?'' মুকুন্দের কাতরোক্তি ও ক্রন্দন

শুনে মহাপ্রভু বললেন, মুকুন্দের বিবাহে অনিচ্ছা তাঁর অবিদিত নয়, কিন্তু যে-বিশেষ উদ্দেশ্যে তিনি তাঁকে বিবাহ করতে বলছেন, তা হল, তাঁর পত্নীর গর্ভে মহাপ্রভুর স্বীকৃত মদনাবতার পুত্র জন্মাবেন। সেই পুত্রকে নরহরিই প্রতিপালন করবেন। প্রভু আরও বললেন, এই বিবাহের জন্য মুকুন্দকে কোনও চেষ্টাই করতে হবে না। মুকুন্দ শ্রীখণ্ডে পৌঁছলে কন্যাপক্ষই উদ্যোগ নিয়ে গুণান্বিতা ও কুলোচিতা কন্যাকে তাঁর হস্তে সমর্পণ করবেন। মুকুন্দ তখন শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহচিন্তায় অত্যন্ত কাতর হয়ে প্রভুর কাছ থেকে এবং ভক্তবৃন্দের, বিশেষত নরহরির কাছ থেকে সাশ্রুনয়নে বিদায় নিয়ে শ্রীখণ্ডের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। মুকুন্দের অতি বিচলিত অবস্থা দেখে করুণাময় মহাপ্রভু বললেন, ''আমার বিরহে বেশি কাতর হলে আমি তোমাকে দেখা দেব। শ্রীখণ্ড থেকে নবদ্বীপ তো খুব দূরের পথ নয়, তুমিও মধ্যে মধ্যে এসে আমার সঙ্গে ও নরহরি সহ ভক্তবৃন্দের সঙ্গে মিলিত হতে পারবে।''

শ্রীখণ্ডে এসে মুকুন্দ গ্রামের দক্ষিণ দিকে বড়ডাঙা নামে একটি বিজন বনে সাধনকুটির নির্মাণ করলেন। মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল করে অচিরেই এক ব্যক্তি এসে মুকুন্দকে কন্যাদানের প্রস্তাব করলে, দু-একটি প্রারম্ভিক কথাবার্তার পরে মুকুন্দ সেই সুলক্ষণা কন্যাকে বিবাহ করলেন। কথিত আছে, কোনও সময়ে মুকুন্দপত্নী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে মহাপ্রভু তাঁর চর্বিত তাম্বুল শ্রীখণ্ডে পাঠান। সেই তাম্বুল সেবনে মুকুন্দপত্নী সুস্থ হলেন ও তাঁর সন্তানলাভের সম্ভাবনা দেখা দিল। ১৪২২ শকাব্দের (১৫০০ খ্রিস্টাব্দের) মাঘী পঞ্চমী তিথির শুভলগ্নে পুণ্যবতী মুকুন্দপত্নী একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন, সেই পুত্রই আমাদের আলোচ্য বালক রঘুনন্দন।

সন্ন্যাসের পর মহাপ্রভু কয়েকদিন শান্তিপুরে থেকে নীলাচলে যাত্রা করলেন। সেইসময় নরহরি তাঁর সঙ্গে যেতে চাইলে প্রভু তাকে মনে করিয়ে দিলেন : ''আমার অবতীর্ণ হওয়ার পিছনে যে-নিগূঢ় তত্ত্ব আছে তা তুমি জান। আমার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তোমার গৌড়মণ্ডলে থাকা প্রয়োজন। তুমি শ্রীখণ্ডকে কেন্দ্র করে ভক্তিতত্ত্ব বিতরণ করবে এবং আমার স্বীকৃত পুত্র রঘুনন্দনকে যথার্থভাবে শিক্ষিত করে তুলবে। আমার বিরহে অত্যন্ত কাতর হলে তুমি আমার দর্শন পাবে। প্রতিবছর রথযাত্রার সময়ে তুমি গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে নীলাচলে গিয়ে আমার কাছে কিছুদিন থাকতেও পারবে।'' নরহরি প্রভুর আদেশের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করে তীব্র বিরহযন্ত্রণা সত্ত্বেও শ্রীখণ্ডে এসে প্রভুর ইচ্ছাপালনে তৎপর হলেন। কালে নরহরি ও মুকুন্দের মিলিত প্রয়াসে শ্রীখণ্ড শ্রীগৌরাঙ্গভক্তি প্রচারের একটি মুখ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল।

সন্ন্যাসের পর মহাপ্রভু নীলাচলে চলে গেলে নবদ্বীপ ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলগুলি যেন হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হল। প্রধান প্রধান ভক্তগণ গৌরাঙ্গবিরহে কাতর হয়ে ইতস্তত বিচরণ করতে লাগলেন, এমনকী নিজের নিজের এলাকা ছেড়ে অন্যত্র বসবাস করতেও শুরু করলেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভুকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন বাংলার ঘরে ঘরে গিয়ে হরিনাম বিতরণ করতে। রূপ, সনাতন প্রমুখ গোস্বামীদের তিনি আদেশ দিয়েছিলেন বৃন্দাবনে অবস্থান করে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার এবং রাধামাধবের লীলামাধুর্য ও লীলাতত্ত্ব অবলম্বনে গ্রন্থরচনা করতে। নরহরি দেখলেন গৌরাঙ্গসঙ্গ-বিচ্যুত ভক্তবৃন্দের সান্ত্বনার জন্য কিছু করা হল না; তাঁরা যে গৌরলীলা আস্বাদনের জন্য লালায়িত হয়ে রয়েছেন! সেই কারণে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার অনুরূপ শ্রীগৌরাঙ্গের নদীয়ালীলার কীর্তন ও প্রচারে নরহরি ও মুকুন্দ আত্মনিয়োগ করলেন। নরহরির

প্রচারে ভক্তবেশধারী শ্রীগৌরাঙ্গই হলেন সর্ব অবতারের শিরোমণি, মাধুর্যমহিমায় পরমসুন্দর, অখণ্ড আনন্দস্বরূপ, পরমাত্মারূপে সর্বজীবের আত্মা, তিনিই পরতত্ত্বসীমা।[৩] তাঁকে ভজন করলেই কৃষ্ণভজন হয়। শ্রীগৌরাঙ্গকে পরম আরাধ্যরূপে প্রতিষ্ঠা করায় নরহরি প্রভৃতিকে গৌরপারম্যবাদী বলা হয়ে থাকে। গৌরচরণে অব্যভিচারিণী ভক্তিই জীবের পক্ষে চরম মঙ্গলপ্রদ—

গৌর ভজহ, গৌর সাধহ, গৌর করহ সার।
গৌর বলিতে জনম যাউক কিছু না চাহিও আর॥

কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গের স্বরূপই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। তিনি মহাভাবস্বরূপিণী রাধারানির অঙ্গ ও ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে প্রেম-ভক্তিদানের নৈপুণ্যে উজ্জ্বল, তাই তাঁর নাম চৈতন্য আর কৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্ন হওয়ায় তিনি স্বয়ং ভগবান। দুইয়ের প্রকাশ একত্র ঘটেছে বলে তাঁর নাম 'কৃষ্ণচৈতন্য'—

চৈতন্যং ভক্তিনৈপুণ্যং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
দ্বয়োঃ প্রকাশাদেকত্র কৃষ্ণচৈতন্য উচ্যতে॥[৪]

শ্রীখণ্ডবাসী ভক্তদের উপর নরহরির মতাদর্শের প্রভাব সহজেই প্রত্যক্ষ হত রথযাত্রার সময়ে। রথের সামনে ছয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় চৈতন্য মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীকৃষ্ণনাম-গুণকীর্তনে মত্ত হলেও শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় কিন্তু পৃথকভাবে গৌরাঙ্গগুণকীর্তনে রত হতেন—

খণ্ডসম্প্রদায়ে করে অন্যত্র কীর্তন।
নরহরি নাচে তাহে শ্রীরঘুনন্দন॥
(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা)

গৌড়মণ্ডলের সকলেই যাতে গৌরাঙ্গতত্ত্ব আস্বাদন করতে পারে সেজন্য নরহরি বঙ্গভাষায় গৌরবিষয়ক পদাবলি রচনা করতে শুরু করেন। গৌরলীলা বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলার পুনরাবৃত্তিবোধে নরহরি গোপীদের অনুসরণে শ্রীচৈতন্যের মধুরভাব অবলম্বনে নিজে সাধন করতে এবং অন্যদেরও একইভাবে অনুপ্রাণিত করতে সচেষ্ট হলেন।

শ্রীখণ্ড তথা গৌড়ীয় ভক্তদের অনেকে নরহরি প্রচারিত এই নাগরভাবের সাধক ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের স্নেহধন্য পার্ষদ কাঞ্চনপল্লি (আধুনিক কাঁচড়াপাড়া)-নিবাসী শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠপুত্র 'কবিকর্ণপুর' উপাধিবিভূষিত পরমানন্দ সেন ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'[৫] রচনা করেন। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে গৌরাঙ্গলীলায় প্রভুর অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর কোনজন শ্রীকৃষ্ণলীলায় কী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তার একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ব্রজের বৃন্দাদেবী চৈতন্যলীলায় মুকুন্দ (শ্লোক ১৭৫), গোপী মধুমতী হয়েছেন নরহরি (১৭৭) এবং রাধামাধবের লীলাসহায়ক প্রদ্যুম্ন, শ্রীচৈতন্যের অভিন্নদেহ রঘুনন্দনরূপ ধারণ করেছেন।

ব্যূহস্তৃতীয়ঃ প্রদ্যুম্নঃ প্রিয়নর্মসখোঽভবৎ।
চক্রে লীলাসহায়ং যো রাধামাধবয়োর্ব্রজে।
শ্রীচৈতন্যাদ্বৈততনুঃ স এব রঘুনন্দনঃ॥ (৭০)

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয় ভক্তপ্রবর এই পিতা ও পিতৃব্যের কাছেই রঘুনন্দনের বড় হয়ে ওঠা। তাঁর বাল্যজীবন আদৌ সাধারণ বালকদের মতো নয়। তিনি শৈশবে অন্য কোনও খেলা খেলতেন না, পিতা ও পিতৃব্যের অনুকরণে কীর্তন করতেন, কখনও চক্ষু মুদ্রিত করে ধ্যানের চেষ্টা করতেন, কখনও বা সমবয়স্ক বালকদের নিজের ভাবে ভাগবত শোনাতেন। ভগবৎপ্রেমে মূর্ছিত হলে তাঁর দেহে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার দেখা যেত। অতিথি বৈষ্ণবদের সেবায় তিনি বিশেষ আনন্দ পেতেন। কুলদেবতা গোপীনাথের সেবা-পূজায় তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। তন্ময়চিত্তে পিতার পূজা দেখতে দেখতে অশ্রু, কম্প, পুলকে তিনি আত্মহারা হয়ে যেতেন। রোজ ভোরে স্নান সেরে রঘুনন্দন তুলসী চয়ন করতেন, যেখানে ভাল ফুল পেতেন সেখান থেকে তা সংগ্রহ করে এনে গোপীনাথকে সাজাতেন। পুত্রের এইরকম ভগবদ্‌ভক্তি দেখে মুকুন্দ অত্যন্ত সুখী ও

নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবলেন, হঠাৎ কোনও কাজে বাইরে যেতে হলেও দেবসেবার কোনও ত্রুটি হবে না।

ঘটনাচক্রে কিছুদিনের মধ্যেই মুকুন্দকে একদিন অন্য গ্রামে যেতে হল। স্বাভাবিকভাবেই তিনি গোপীনাথজীর সেবা-পূজার ভার রঘুনন্দনের উপর দিয়ে গেলেন। রঘুনন্দন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তুলসীপত্র ও পুষ্পসম্ভার নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলেন। প্রথমে তুলসীপত্রে চন্দন মাখালেন, তারপর মায়ের দেওয়া শীতল ও নৈবেদ্য সুন্দর করে সাজিয়ে রাখলেন। গোপীনাথকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরিয়ে মালাচন্দন ও ফুল দিয়ে চমৎকার করে সাজালেন। বালক রঘু মন্ত্রতন্ত্র তো কিছুই জানেন না, কেবল প্রেমবিহ্বল স্বরে আকুতি জানিয়ে বারবার বলতে লাগলেন, ''ঠাকুর খাও, দেখো, মা কত কী দিয়েছেন, ক্ষীরের নাড়ু মাখন-মিষ্টি সব কিছু আছে। তুমি এসে খেয়ে নাও।''

বারবার বলা সত্ত্বেও গোপীনাথ উঠলেনও না খেলেনও না। রঘুর তখন ভারি অভিমান হল। রোজ তিনি খান আর আজ খাচ্ছেন না! রঘু বলতে লাগলেন, ''যদি তুমি না খাও তাহলে কিন্তু তোমাকে আমি আর ভালবাসব না, কথাও বলব না। তখন কে তোমাকে ফুল এনে দেবে, মালা গেঁথে দেবে, কে গান শোনাবে?'' তখনও গোপীনাথ খেলেন না দেখে রঘুর রাগ হল, বললেন, ''কী! তুমি খাবে না? বাবা বাড়ি এলে আমি সব বলে দেব, আরও বলব, তোমার ঠাকুর তোমার হাতেই খেতে ভালবাসে, আমার হাতে খায় না, আমি তাকে এত ভালবাসি তবুও সে আমাকে একটুও ভালবাসে না।''

রঘুনন্দন এত ভয় দেখালেন, ঠাকুর কিন্তু তবুও খেলেন না। রঘু অবাক হলেন—''কী! তুমি বাবাকেও ভয় পাও না?'' কিছুতেই গোপীনাথকে খাওয়াতে না পেরে অসহায় অভিমানে রঘু কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, ''আমি আর তোমার কাছে আসব না, তুমি একলা থাকো।'' বলছেন বটে, কিন্তু গোপীনাথকে ছেড়ে যাওয়া কি আদৌ সম্ভব? মন্দির থেকে বাইরে বেরিয়ে শেষবারের মতো গোপীনাথের দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই রঘু একেবারে পুলকে আত্মহারা! এ কী দেখছেন! শেষপর্যন্ত গোপীনাথ তবে অনুরোধ রেখেছেন! সাক্ষাৎ ব্রজগোপালরূপে আসনে বসে রঘুনন্দনের দেওয়া মাখন, মিষ্টি, সর, ক্ষীরের নাড়ু সবই খাচ্ছেন। রঘুর বেদনাশ্রু এখন আনন্দধারায় তাঁকে একেবারে প্লাবিত করে দিতে লাগল।

গোপীনাথের খাওয়া শেষ হলে রঘুনন্দন তাঁর মুখ মুছিয়ে পরমস্নেহে আলিঙ্গন ও চুম্বন করে যথাস্থানে বসিয়ে পরিতৃপ্ত ও চরিতার্থহৃদয়ে মন্দির থেকে ঘরে এলেন। এদিকে মুকুন্দদাস গৃহে ফিরেছেন, প্রসাদ ছাড়া তো তিনি জলগ্রহণ করেন না; পূজা শেষ হয়েছে জেনে রঘুকে প্রসাদ আনতে বললেন। রঘুনন্দন সহজভাবেই জানালেন—''বাবা, তোমার ঠাকুর তো সবই খেয়েছেন, কিছুই তো বাকি রাখেননি।'' মুকুন্দ এই কথা শুনে পরম বিস্মিত হলেন এবং পরীক্ষা করার জন্য রঘুকে আবার পরদিন ঠাকুরকে খাওয়াতে বলে নিজে শ্রীমন্দিরের এক নিভৃত কোণে লুকিয়ে রইলেন। সেদিনও রঘুনন্দন অনেক সাধ্যসাধনা করে ঠাকুরকে খাওয়ালেন; শেষে যখন ঠাকুর একটি ক্ষীরের নাড়ুর অর্ধেকটা মাত্র খেয়েছেন তখন মুকুন্দ বেরিয়ে সামনে এলেন। মুকুন্দকে দেখামাত্র গোপীনাথ বিগ্রহে বিলীন হয়ে গেলেন, অর্ধেক নাড়ু বিগ্রহের হাতে ধরা রইল। পুত্রের প্রেমভক্তিতে গোপীনাথের ভোজন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে আনন্দবিহ্বল মুকুন্দ তাঁর পরম প্রেমিক পুত্রকে কোলে নিয়ে বারবার চুম্বন করতে লাগলেন।

বারোটি শ্লোকে রঘুনন্দনরচিত 'গৌরভাবামৃত-স্তোত্র' গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের পরম আদরের বস্তু। শোনা যায়, মাত্র আট বছর বয়সে মহাপ্রভুর

দর্শনলাভ করে আনন্দোৎফুল্ল রঘুনন্দন এই বারোটি শ্লোকে তাঁর চরণবন্দনা করেন। চমৎকার সেই শ্লোকনিচয়ের রচনা একটি আট বছরের বালকের পক্ষে প্রায় অসম্ভব বলে বোধ হয়। কিন্তু যিনি অবতারপুরুষের স্বীকৃত পুত্র, পাষাণবিগ্রহ যাঁর কাছে প্রকট হয়ে সেবাগ্রহণ করেন তাঁর কণ্ঠে দেবী সরস্বতীর অধিষ্ঠানের ফল অনন্যসাধারণ হলেও অসম্ভব নয়। প্রসঙ্গত জানানো যায়, পরমানন্দ সেন (উত্তরকালীন কবিকর্ণপুর) শ্রীচৈতন্যের আশীর্বাদে মাত্র সাত বছর বয়সে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক শ্লোক রচনা করে মানুষের বিস্ময় উৎপাদন করেছিলেন—

সাত বৎসরের শিশু নাহি অধ্যয়ন।
ঐছে শ্লোক করে লোকের চমৎকার মন॥
(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ১৬।৬৯)

পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য গৌরভাবামৃত-স্তোত্রের প্রথম স্তবকটি সানুবাদ উদ্ধৃত করা হল—

কনকরুচিরগৌরঃ সর্বচিত্তৈকচৌরঃ।
প্রকৃতিমধুরদেহঃ পূর্ণলাবণ্যগেহঃ॥
কলিতললিতরূপঃ ক্ষুব্ধকন্দর্পভূপঃ।
স্ফুরতু হৃদি নটেন্দ্রঃ শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রঃ॥
কনকরুচির গোরা একমাত্র চিতচোরা
পুরুষপ্রকৃতি সবাকার।
সহজে মধুর দেহ অখণ্ড লাবণ্য সেহ
প্রতি তনু ঝরে শতধার॥
হেরি সুললিত রূপ ক্ষুভিত মদনভূপ
অপরূপ বিনোদিয়া সাজ।
অপ্রাকৃত নট-ইন্দ্র সেই নবদ্বীপচন্দ্র
মোর হৃদে করুন বিরাজ॥
(শ্রীখণ্ড নিবাসী প্রয়াত শ্রীমৎ রাখালানন্দ ঠক্কুর শাস্ত্রী কৃত অনুবাদ[৬])

গোপীনাথে রঘুনন্দনের অসাধারণ ভক্তিভাব ও সেবাপ্রাণতার কথা শুনে মহাপ্রভু একদিন কৌতুকহাস্যে মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''তুমি রঘুর পিতা না রঘু তোমার পিতা?''

মুকুন্দ দাসেরে পুছে শচীর নন্দন।
তুমি পিতা পুত্র তোমার শ্রীরঘুনন্দন॥
কিবা রঘু পিতা তুমি তাহার তনয়?
নিশ্চয় করিয়া কহ যাউক সংশয়॥
মুকুন্দ কহে রঘুনন্দন মোর পিতা হয়।
আমি তার পুত্র এই আমার নিশ্চয়॥
আমা সভার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে।
অতএব পিতা রঘু আমার নিশ্চিতে॥
শুনি হর্ষে কহে প্রভু কহিলে নিশ্চয়।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু হয়॥
(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ১৫।১১৩-১১৭)

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সবদিক বিবেচনা করে মুকুন্দকে চিকিৎসা দ্বারা ধন উপার্জনে, সেই ধন দিয়ে দীন-দরিদ্রের উপকার সাধনে এবং নির্বিশেষে সকলকে ভক্তিধর্মশিক্ষা দিয়ে ধর্ম অর্জনে আদেশ করেন। প্রভু নরহরিকে তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ গদাধর পণ্ডিত প্রভৃতি ভক্তজনের সঙ্গে প্রেম আস্বাদনের অধিকার দিয়েছিলেন আর রঘুনন্দনকে গোপীনাথের সেবা-পূজায় একান্তভাবে নিরত থাকতে বলেছিলেন। (তদেব, ১৫।১৩০-৩২)

মহাপ্রভু তাঁর স্বীকৃত পুত্র এই রঘুনন্দনে কতখানি শক্তি সঞ্চারিত করেছেন তা বোঝার জন্য কোনও এক সময় শ্রীপাদ অভিরাম গোস্বামী শ্রীখণ্ডে এসেছিলেন। বলা হয়, অভিরাম, শ্রীকৃষ্ণাবতারে সখা শ্রীদাম ছিলেন। ইনি মহাতেজস্বী, শালগ্রাম শিলা প্রকৃত না হলে এঁর প্রণামে ফেটে যেত। তাঁর প্রণামের ফলেই শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সাতটি পুত্র বিনষ্ট হয়েছিল। রঘুনন্দনকে দেখতেই অভিরাম শ্রীখণ্ডে এসেছেন জেনে সপত্নীক মুকুন্দ বিশেষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে ছেলেকে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন। অভিরাম মুকুন্দর বাড়িতে এসেও রঘুনন্দনের দেখা না পেয়ে নিতান্ত বিষণ্ণচিত্তে বড়ডাঙার নির্জনে গিয়ে বসে রইলেন। ওদিকে

বালক রঘু কীভাবে যেন সকলের অলক্ষ্যে বড়ডাঙার বনে গিয়ে অভিরামের সঙ্গে মিলিত হলেন। অভিরাম তাঁকে প্রণাম করলে রঘুনন্দনও অভিরামকে আলিঙ্গন করলেন, কোনও বিপত্তি ঘটল না। মহাপ্রভুর বিশেষ শক্তি যে রঘুনন্দনে সঞ্চারিত হয়েছে সে-বিষয়ে সুনিশ্চিত হয়ে অভিরাম রঘুনন্দনের সঙ্গে সংকীর্তন ও নৃত্যানন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। উভয়ের মিলন সংবাদ সপত্নীক মুকুন্দর কানে পৌঁছলে তাঁরা দুজনে ভয়ে ও বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে একেবারে বড়ডাঙায় এসে উপস্থিত হলেন। অভিরাম ও রঘুর প্রেমবিহ্বল নৃত্যগীতি দেখে শুনে তাঁরা আশ্বস্ত তো হলেনই, তাঁদেরও প্রেমানন্দের অবধি রইল না।[৭]

রঘুনন্দন যে সত্যই মহাপ্রভুর স্বীকৃত পুত্র সেই প্রমাণ ভক্তগণের কাছে মহাপ্রভুই দিয়েছিলেন। একবার রথের সময় প্রতি বছরের মতো গৌড়ীয় ভক্তমণ্ডলী নীলাচলে উপস্থিত হলে সন্ধ্যাকালে শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে ভক্তসঙ্গে কীর্তন করতে মনস্থ করলেন। কীর্তন আরম্ভের ঠিক আগে প্রভু বালক রঘুনন্দনকে কোলে নিয়ে নিজের গলার মালা পরিয়ে চন্দনচর্চিত করলেন, পরে উপস্থিত সকল ভক্তকে মালা ও চন্দন দিয়ে পরিতৃপ্ত করলেন। আবার কীর্তন শেষ হলে 'দধিহরিদ্রাকটোরা' অর্থাৎ হলুদ মেশানো দইয়ের ভাঁড় ভাঙবার জন্য প্রভু রঘুনন্দনের হাতেই দিলেন। কাটোয়ার গৌরাঙ্গভক্ত, রঘুনন্দনের অন্তরঙ্গ যদুনন্দন এই ঘটনা স্মরণ করে একটি পদ রচনা করেছিলেন, তার একাংশ :

সবে মিলি উচ্চৈঃস্বরে গায় হরিগুণ।
আপনি লইয়া প্রভু শ্রীমালাচন্দন॥
শ্রীরঘুনন্দন ভালে দিল গৌরচন্দ্র।
কণ্ঠে দিল পুষ্পমালা পাইয়া আনন্দ॥
দধিভাণ্ড ধরি পুনঃ শ্রীশচীনন্দন।
শ্রীরঘুনন্দনকরে করিল অর্পণ॥
আপনি গায়েন প্রভু লৈয়া ভক্তগণ।
আদেশিল দধিভাণ্ড করিল ভঞ্জন॥
মহাপ্রভুর আজ্ঞা পাঞা শ্রীরঘুনন্দন।
কীর্তনমণ্ডলে ভাণ্ড করিল ভঞ্জন॥
সবে গড়াগড়ি যায় তাহার উপরে।
এ যদুনন্দন গায় হরিষ অন্তরে॥[৮]

কেবল অন্তরঙ্গ যদুনন্দন নয়, পরমভক্ত বিশেষ স্নেহভাজন শ্রীনিবাস থেকে শুরু করে পূজ্যপাদ সনাতন গোস্বামী পর্যন্ত অনেকেই রঘুনন্দনের মহিমা বিশেষভাবে কীর্তন করেছেন। বস্তুতপক্ষে শ্রীখণ্ডকে কেন্দ্র করে রঘুনন্দনের পিতৃব্য আচার্য নরহরি যেভাবে গৌরাঙ্গলীলা বর্ণন ও তার আস্বাদনের সর্বজনীন ব্যবস্থা করেছিলেন তার জন্য সকল গৌড়ীয় বৈষ্ণব তাঁর কাছে চিরঋণী। মাতৃভাষায় গৌরকথা রচনার যে-সূত্রপাত নরহরি ঘটিয়েছিলেন[৯] তার অনুসরণে উত্তরকালে বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যভাগবত (যে-গ্রন্থের আগের নাম ছিল চৈতন্যমঙ্গল), লোচনানন্দ ঠাকুর শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা করে বৈষ্ণবসমাজে প্রচার করলেন। কেবল শ্রীগৌরাঙ্গপার্ষদ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের সাধ্য-সাধন মার্গের নির্দেশক গৌরপারম্যবাদ ও নাগরবাদের প্রবক্তা সর্বজনমান্য পিতৃব্য নরহরির সুযোগ্য উত্তরপুরুষরূপে নয়, তাঁর নিজের অলৌকিক জন্ম-কর্মের জন্য এবং ব্যাবহারিক জীবনে তাঁর অনবদ্য চরিত্রের কারণে রঘুনন্দন গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে শিরোমণিরূপে গৃহীত হয়েছেন। রঘুনন্দনের যেমন রূপ তেমনই গুণ। জগতের সকলেই তাঁর সমান স্নেহ ও সম্প্রীতিভাজন। জীবনে তিনি কখনও কারও প্রতি একটিও কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেননি। সংকীর্তনে যেমন তাঁর দেহবুদ্ধিবিরহিত গীতিমাধুরী ও মনোহর নৃত্যভঙ্গিমা, ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাখ্যাও তেমনই চমৎকারিত্বে হৃদয়গ্রাহী ও প্রেমসঞ্চারে অব্যর্থ।

চৈতন্যমঙ্গলকাব্যে লোচনানন্দ ঠাকুরের মন্তব্য—

তাঁর (নরহরির) ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন ঠাকুর।
সকল সংসারে যশ ঘোষয়ে প্রচুর॥

নরহরির অপ্রকটের অনেক আগেই রঘুনন্দনের পিতা মুকুন্দ মরদেহ ত্যাগ করেছিলেন। ১৫০৩ শকাব্দে (১৫৮১ খ্রিস্টাব্দে) কার্তিক মাসের কৃষ্ণা একাদশীর দিন নরহরি নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। এক বৎসর পরে দাস গদাধর ও নরহরির তিরোধান উপলক্ষ্যে রঘুনন্দনের ব্যবস্থাপনায় বহু গৌরাঙ্গভক্তের উপস্থিতিতে যে-প্রয়াণ মহোৎসব হয় তাতে সকলেই রঘুনন্দনের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন :

কহিতে কি মহান্তগণের প্রেমাবেশ।
শ্রীরঘুনন্দনে শ্লাঘা করয়ে অশেষ॥
কেহ কহে শ্রীরঘুনন্দনে প্রীতি যার।
জন্মে জন্মে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বশ তার॥

(ভক্তিরত্নাকর, নবম তরঙ্গ)

রঘুনন্দনের সাগ্রহ আমন্ত্রণে নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবা দেবী সপার্ষদ শ্রীখণ্ডে এসে ভক্তিভাব ও মাতৃভাবে সকলকে বিমুগ্ধ করেছিলেন। রঘুনন্দনও বিনম্র ভক্তি ও ভজনে জাহ্নবা মাতার বিশেষ স্নেহের পাত্র হয়েছিলেন।

কুলদেবতা গোপীনাথজীর পাশে নরহরি গৌরাঙ্গমূর্তি স্থাপন করেন। রঘুনন্দন পরমভক্তি ও ভালবাসা দিয়ে সারাজীবন এই গৌর-গোপীনাথের সেবাপূজা করেছিলেন। ইষ্টদেবের আশীর্বাদে তাঁর গুরুভাবের বিশেষ বিকাশ ঘটেছিল, বহুজন তাঁর কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে ভক্তিরস আস্বাদন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর নিজের ভক্তিমান দুই পুত্র কানাই ও বংশীবদন দীক্ষালাভ করেন ঠাকুর নরহরির কাছেই। কানাই স্বয়ং বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর স্নেহধন্য ছিলেন। দুই ভাই-ই ভক্তিরসজ্ঞ ও ভক্তিশাস্ত্রজ্ঞরূপে বৈষ্ণবসমাজে বিশেষভাবে আদৃত হন। এমনকী কানাইয়ের পুত্র মদনের মধ্যেও আবাল্য ভক্তিরসের

গোপীনাথজী (বাঁদিকে), যিনি বালক রঘুনন্দনকে দর্শন দিয়েছিলেন এবং নরহরি-প্রতিষ্ঠিত গৌরাঙ্গমূর্তি

ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত ছিল। মদনও নরহরির কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে ধন্য হয়েছিলেন।

নরহরির দেহত্যাগ সম্বন্ধে এক অলৌকিক বার্তা প্রচলিত আছে। শোনা যায়, তিনি প্রেমাবিষ্ট অবস্থায় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বিগ্রহের সামনে ভক্তগণসহ গৌরাঙ্গগুণকীর্তন করতে করতে অকস্মাৎ অন্তর্হিত হন। রঘুনন্দনের নিত্যলীলায় প্রবেশকথাও তাঁর দিব্যজীবনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। রঘুনন্দনের বিশেষ প্রিয় শ্রীনিবাস এবং শ্রীনিবাসের অতিঘনিষ্ঠ ও রঘুনন্দনের আশীর্বাদধন্য নরোত্তম ও রামচন্দ্র একত্রে শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন করে শ্রীখণ্ডে এসে, খেতরী যাবার জন্য রঘুনন্দনের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। রঘুনন্দন বললেন, ''এবার খেতরী থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।'' একথার তাৎপর্য কী হতে পারে ভাবতে ভাবতে তাঁরা যতদূর সম্ভব শীঘ্র

খেতরী থেকে ফিরে এসে রঘুনন্দনের চরণবন্দনা করলেন।

রঘুনন্দন নির্জনে শ্রীনিবাসকে নিজের কোলে বসিয়ে অনেক উপদেশ দিলেন, তারপর বললেন, ''আগামী শ্রাবণ শুক্লাচতুর্থী তিথিতে আমি নিত্যলীলায় প্রবেশ করব, তুমি সংকীর্তন আয়োজন করো।'' তিনদিন মহাসংকীর্তনের পর রঘুনন্দন বারবার 'নরহরির প্রাণগৌর' নাম উচ্চারণ করতে লাগলেন। অবশেষে ১৫০৬ শকাব্দের (১৫৮৪ খ্রিঃ) শ্রাবণ শুক্লাচতুর্থী তিথিতে শ্রীগোপীনাথ-গৌরাঙ্গকে অনিমেষনয়নে দর্শন করতে করতে তিনি মর্ত্যলীলা সাঙ্গ করলেন।

সদ্‌গুরু শ্রীরঘুনন্দন তাঁর প্রিয়শিষ্য কবিশেখরের পদে বড় সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছেন—

ভজহুঁ রে মন মুকুন্দনন্দন শ্রীরঘুনন্দন নাম।
পতিত পাবন ও ভবরঞ্জন দীন দুষ্কৃত ত্রাণ॥...
অভয় পদতল মধুর শীতল করহ ইহ মন ধ্যান
কহই শেখর এ ভবসাগর তরহ ইহ করি গান।
ভজ সেই পদ পরম সম্পদ শ্রীরঘুনন্দন নাম॥

এই হল 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'প্রোক্ত সেই 'ছোট ছেলেটি'র সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে শ্রীরঘুনন্দন ও তাঁর পরিবার সম্পর্কে যে-তথ্যাবলি পরিবেশিত হল, তার জন্য মুখ্যত শ্রীখণ্ডনিবাসী শ্রীগৌরাঙ্গগুণানন্দ ঠাকুর বিরচিত 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব' শীর্ষক গ্রন্থখানির (প্রকাশক শ্রীখণ্ড মধুমতী সমিতি, শ্রীখণ্ড, বর্ধমান) উপর নির্ভর করা হয়েছে। নির্ভরতার কারণ কেবল এই নয় যে গ্রন্থকার ছিলেন শ্রীখণ্ডের অধিবাসী এক নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। তিনি তাঁর গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় নিজের বংশপ্রণালী ও গুরুপ্রণালীর যে-পরিচয় দিয়েছেন তাতে দেখা যায় লেখক জন্মবংশপরম্পরা হিসাবে শ্রীরঘুনন্দনের ত্রয়োদশ পুরুষ এবং গুরুবংশপরম্পরাক্রমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ ও রঘুনন্দনের বহুমানিত পিতৃব্য শ্রীনরহরির অধস্তন নবম পুরুষ। স্বভাবতই বিশেষ শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা সহকারে বইটি লেখা হয়েছে।

গৌরগুণানন্দঠাকুর তাঁর গ্রন্থটিকে 'শ্রীশ্রীনরহরিচৈতন্যঃ প্রসীদতু' বলে উৎসর্গ করেছেন এবং জানিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে মনগড়া কিছু নেই, সর্বজনমান্য প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থগুলি তো বটেই, সেইসঙ্গে 'প্রাচীন শ্লোক ও মহাজনপদাবলী অবলম্বনে এবং গুরুপরম্পরা অবগত' হয়ে এই গ্রন্থটি লিখিত হয়েছে। মুদ্রিত বৈষ্ণবগ্রন্থগুলি পাওয়া বিশেষ শ্রমসাধ্য হলেও নিতান্ত অসম্ভব না হতে পারে কিন্তু শ্রীখণ্ডের প্রাচীন ঐতিহ্যধৃত তথ্যাবলি সংগ্রহ করা সাধারণ অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে আদৌ সম্ভবপর নয়। শ্রীনরহরির মুখ-বিনিঃসৃত 'শ্রীশ্রীভক্তিচন্দ্রিকা' গ্রন্থের টীকা করতে গিয়ে শ্রীমদ্ রাখালানন্দশাস্ত্রী গৌরগুণানন্দ ঠাকুরের নিজস্ব গ্রন্থভাণ্ডারের সহায়তা লাভের স্বীকৃতি দিয়েছেন।

গৌরগুণানন্দঠাকুর, যিনি নিজেকে 'শ্রীশ্রীনরহরিচৈতন্যদাসানুদাস' বলে পরিচয় দিয়েছেন, তিনি বৈষ্ণবশাস্ত্রে ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করলেও পরম্পরালব্ধ ভাবমাধুর্যে মগ্ন থেকে 'গৌরপ্রেমের নিগূঢ় রস আস্বাদন' করাই ছিল তাঁর জীবনসাধনা। এই সাধনার অবলম্বন ছিল তাঁর মনমাতানো, প্রাণকাঁদানো সংকীর্তন। কীর্তনজগতে তিনি আচার্যরূপে বন্দিত হয়েছিলেন।

আর একটি দ্রষ্টব্য বিষয়—গ্রন্থটির প্রকাশক 'শ্রীখণ্ড মধুমতী সমিতি'। এই প্রবন্ধেই জানানো হয়েছে, কৃষ্ণলীলার গোপী মধুমতীই চৈতন্যলীলায় শ্রীনরহরিরূপে চিহ্নিত হয়েছিলেন। কাজেই শ্রীখণ্ডের প্রকাশনা সমিতির নাম 'মধুমতী' দেওয়ায় শ্রীনরহরি এবং তাঁর সাধনমার্গের প্রতি শ্রীখণ্ডবাসীর চিরাগত ভক্তি-বিশ্বাসের সহজ প্রকাশ ঘটেছে—একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

তথ্যসূত্র

১। মহারাষ্ট্রের সর্বজনপূজ্য সন্ত মহাত্মা নামদেবের জীবনেও এই ধরনের একটি ঘটনার কথা শোনা যায়। নামদেব ১২৭০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা দমশেঠ, মা গোনাবাঈ। বাল্যকালে নামদেব পিতামাতার সঙ্গে পান্ধারপুরে ছিলেন। পুণ্ডলীক নামে এক ভক্তের প্রতি কৃপাবশত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিঠ্ঠল বা বিঠোবা নামে পান্ধারপুরে চির অধিষ্ঠান করে থাকেন। দমশেঠ পরমভক্ত ছিলেন, প্রত্যহ বিঠোবার মন্দিরে গিয়ে ভগবানকে দুধ নিবেদন করতেন। একদিন কোনও কারণে তিনি নিজে যেতে না পারায় শিশুপুত্র নামদেবকে দিয়ে মন্দিরে দুধ পাঠিয়ে দিলেন। নামদেবের স্থির বিশ্বাস, বিঠোবা দুধ খেয়ে নেবেনই। অনেক করে বলার পরেও যখন ঠাকুর দুধ খাচ্ছেন না, বালকের মনে হল, নিশ্চয় সে কিছু অন্যায় করেছে তাই বিঠোবা খাচ্ছেন না। তার খুব দুশ্চিন্তাও হল, বাবাকে সে কী বলবে? অনেক অনুরোধ করে শেষে নামদেব আকুলভাবে কাঁদতে লাগল। সরল বিশ্বাসী শিশুর আকুতিতে বিঠ্ঠল শেষ পর্যন্ত দুধ না খেয়ে পারলেন না। খালিপাত্র হাতে নামদেব বাড়ি গেল, তার মা কিন্তু তার কথা কিছুতেই বিশ্বাস করলেন না, ভাবলেন নামদেব নিজে দুধ খেয়ে নিয়ে এখন বিঠ্ঠলের নামে বলছে। পরদিন বাবা আবার ছেলের হাত দিয়ে দুধ পাঠালেন এবং নিজেও সঙ্গে গেলেন। বিঠোবা নামদেবের দেওয়া দুধ খেলেন এবং কৃপা করে পিতাকেও সে-দৃশ্য দেখালেন।

২। নরহরি সরকার, *বৈষ্ণব পদাবলী*, সম্পাদনা : সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, (সাহিত্য সংসদ : কলিকাতা, ১৩৫৩) পৃঃ ১৪৩

৩। শ্রীনরহরিমুখবিনিঃসৃত *শ্রীশ্রীভক্তিচন্দ্রিকা* গ্রন্থে (প্রকাশক শ্রীখণ্ড মধুমতী সমিতি, শ্রীখণ্ড, বর্ধমান, ১৪১৯) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামাবলম্বনে অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব একটি শ্লোকে প্রকাশিত হয়েছে (প্রথম পটল, শ্লোক ৩)—

ভক্তীশয়োরভেদেন কৃষ্ণচৈতন্য উচ্যতে।
ভেদাৎকৃষ্ণস্য ভক্তেশ্চ প্রসিদ্ধিস্তত্ত্ববেদিনাম্॥

অর্থাৎ যাঁরা ভক্তি ও ভগবানের অভেদ চিন্তা করেন তাঁদের কাছে অভেদ অবলম্বনেই কৃষ্ণচৈতন্য সংজ্ঞা সিদ্ধ হয় আর যাঁরা শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্তিকে পৃথকভাবে অর্থাৎ আধার-আধেয়রূপে চিন্তা করেন সেই ভেদবাদী তত্ত্বজ্ঞদের কাছে ভেদ অবলম্বনেই 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম সিদ্ধ হয়।

৪। *শ্রীশ্রীভক্তিচন্দ্রিকা*, শ্লোক ৩-এর টীকা দ্রষ্টব্য।

৫। কবিকর্ণপুর, *গৌরগণোদ্দেশদীপিকা*, সম্পাদনা : যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী (নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষৎ, ২০০৩)

৬। 'শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব' গ্রন্থে সানুবাদ বারোটি শ্লোকই উদ্ধৃত হয়েছে।

৭। শ্রীরঘুনন্দন ও শ্রীপাদ অভিরাম গোস্বামীর সম্মিলন বিষয়ে পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধবদাসকৃত একটি পদ উদ্ধৃত হয়েছে। (দ্রঃ পৃঃ ৭০-৭১)

৮। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৭৪, পৃঃ ৭১-এ শ্রীমাধবঘোষের পদ উল্লিখিত

৯। গৌরলীলাদরশনে ইচ্ছা বড় হয় মনে
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মুঞি ত অতি অধম লিখিতে না জানি ক্রম
কেমন করিয়া তাহা লিখি॥
কিছু কিছু পদ লিখি যদি ইহা কেহ দেখি
প্রকাশ করয়ে প্রভু লীলা
নরহরি পাবে সুখ ঘুচিবে মনের দুখ
গ্রন্থগানে দরবিবে শিলা॥

(দ্রঃ ২ নং তথ্যসূত্রে উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ১৪০)